শ্রীবরদরাজবিরচিতা

লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী

(মূল এবং সরল বাংলা ব্যাখ্যা-সহিত)

ব্যাখ্যাকার ও সম্পাদক

ডঃ বিপদ্‌ভঞ্জন পাল

সদেশ

১০১সি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬

পুরোবাক্

ভাষা-শিক্ষায় ব্যাকরণের উপযোগিতা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নাই। মাতৃ-ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের প্রয়োজন সাক্ষাৎ সকলের উপলব্ধ না হলেও, অন্য কোন ভাষা আয়ত্ত করতে গেলে পদে পদে আমরা ব্যাকরণের আবশ্যকতা অনুভব করি। ব্যাকরণ যে কেবল লঘু উপায়ে ভাষা-শিক্ষায় সহায় হয়, তাই নয়, শুদ্ধভাবে কোন ভাষা বলতে ও লিখতে ব্যাকরণ পাঠ অত্যাবশ্যক। ব্যাকরণ না জেনে কেউ ভাষাবিদ্ হতে পারে না এবং সাহিত্যের মর্মোপলব্ধিও সম্ভব হয় না। এই কারণেই প্রাচীনরা শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,— 'যদ্যপি বহু নাধীষে তথাপি পঠ পুত্র ব্যাকরণম্'। প্রয়োজন আছে বলেই প্রায় সকল ভাষারই ব্যাকরণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সংস্কৃত পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভাষা। এই ভাষা সাহিত্যসম্পদে অতিসমৃদ্ধ, পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য এই ভাষাতেই সংরক্ষিত আছে। স্বভাবতঃই পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যাকরণও সংস্কৃত ভাষাতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্যই রচিত হয়েছিল। ঠিক কখন কিভাবে ব্যাকরণ রচনা শুরু হয়েছিল, তা আজ জানার কোন উপায় নাই। ভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্রহ্মাকেই ব্যাকরণের আদি প্রবক্তা বলেছেন। ব্রহ্মা বৃহস্পতিকে, বৃহস্পতি ইন্দ্রকে, ইন্দ্র ভরদ্বাজকে, ভরদ্বাজ ঋষিগণকে এবং ঋষিরা ব্রাহ্মণদের ব্যাকরণ উপদেশ করেছিলেন। পতঞ্জলি ব্যাকরণের অনাদিত্বই স্বীকার করেছেন বলে মনে হয়। যাহোক্ ব্রাহ্মণ বৈয়াকরণদের মধ্যেও পাণিনি নিশ্চিতই প্রথম নন। যুধিষ্ঠির মীমাংসকের মতে পাণিনির পূর্বে অন্ততঃ ৮৫ জন বৈয়াকরণ জন্মেছিলেন। পাণিনি নিজেও অষ্টাধ্যায়ীতে শাকল্য, শাকটায়ন প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন। তবে এরা সকলেই যে ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তা নয়, যারা করেছিলেন তাদের সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অত্যল্প। পরম্পরা হতে জানা যায় যে, পাণিনি-পর্যন্ত আটটি ব্যাকরণ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। সেগুলি হচ্ছে ব্রাহ্ম, ঐশান, ঐন্দ্র, প্রাজাপত্য, বার্হস্পত্য, ত্বাষ্ট্র, আপিশল এবং পাণিনীয়। —'ব্রাহ্মমৈশানৈন্দ্রং চ প্রাজাপত্যং বৃহস্পতিম্। ত্বাষ্ট্রমাপিশলঞ্চেতি পাণিনীয়মষ্টকম্।।' বোপদেবও আটটি ব্যাকরণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন; কিন্তু নামে কিছু ভেদ আছে। তিনি ইন্দ্র, চান্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলি, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর এবং জৈনেন্দ্র এই আটজনকে আদিশাব্দিক বলেছেন, —ইন্দ্রশ্চান্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ। পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ।। পরেও সারস্বত, মুগ্ধবোধ, সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি অনেক ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল। কিন্তু অপর সকল ব্যাকরণই অল্পায়ুঃ, একমাত্র সর্বশাস্ত্রোপকারক পাণিনীয় শব্দশাস্ত্রই আজও অনির্বাণ আছে। পতঞ্জলি একে 'সর্ববেদপারিষদ' এবং ব্যাসদেব একে সর্বশাস্ত্রোপকারক মহাশাস্ত্র বলেছেন।

সর্ববেদপারিষদং হীদং শাস্ত্রম্।' (২।১।৫৮ সূত্রের ভাষ্য)।

পাণিনীয়ং মহাশাস্ত্রং পদসাধুত্বলক্ষণম্।
সর্বোপকারকং গ্রাহ্যং কৃৎস্নং ত্যাজ্যং ন কিঞ্চন।।

অন্যূন ২৫০০ বছর ধরে এই পাণিনি-ব্যাকরণের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলছে। মধ্যবর্তিকালে সাময়িকভাবে কলাপাদি ব্যাকরণ দেশবিশেষে প্রভাব বিস্তার করলেও তা

স্থায়ী হয় নি, সমগ্র ভারতে পাণিনি-ব্যাকরণেরই পঠন-পঠন অব্যাহত আছে।

পাণিনি-ব্যাকরণ ত্রিমুনি ব্যাকরণ নামেও প্রসিদ্ধ। পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলি এই তিন মনীষীর প্রতিভাসমন্বিত হয়ে অষ্টাধ্যায়ী সম্পূর্ণতা লাভ করে। কাত্যায়ন বার্তিককার এবং পতঞ্জলি ভাষ্যকাররূপে প্রসিদ্ধ। এদের মধ্যে পতঞ্জলির সুগভীর প্রজ্ঞা ও অনবদ্য রচনাশৈলী ব্যাকরণকে এমন এক মহিমা সমর্পণ করেছিল, যার থেকে উচ্চতর কোন অবস্থা কল্পনা করা যায় না। প্রায় সহস্র বৎসর তিনি ভারতীয় শাব্দিকগণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভর্তৃহরি পতঞ্জলি ভাষ্যকে অনুসরণ করেই বাক্যপদীয়' নামে এক অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করে ব্যাকরণকে দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত করেন।

ঐ সময় জয়াদিত্য নামে এক নবীন বৈয়াকরণও অষ্টাধ্যায়ীর নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেন। তার সেই ব্যাখ্যা 'কাশিকা' নামে খ্যাত। তবে তিনি সম্পূর্ণ অষ্টাধ্যায়ীর বৃত্তি রচনা করে যেতে পারেন নি, ৫।৪।১ সূত্র হতে অবশিষ্ট সূত্রগুলির উপর বৃত্তি রচনা করেন তৎপুত্র বামন। এই ব্যাখ্যাও যথেষ্ঠ জনপ্রিয় হয় এবং এর উপর হরদত্ত ও জিনেন্দ্রবুদ্ধি যথাক্রমে পদমঞ্জরী ও ন্যাস নামে টীকা রচনা করেন। জয়াদিত্য প্রভৃতি যথোদ্দেশপক্ষ অর্থাৎ পাণিনি যে ক্রমে সূত্রসমূহ নিবদ্ধ করেছিলেন, সেই ক্রমেই সূত্রের ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই পদ্ধতির অসুবিধা এই যে, সম্পূর্ণ অষ্টাধ্যায়ী আয়ত্ত না করা পর্যন্ত কোন পদ-গঠন বা প্রয়োগের শুদ্ধি অশুদ্ধি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই কারণেই এক সময় পাণিনি-ব্যাকরণের পঠন-পাঠনে অনাগ্রহ জন্মে। স্বয়ং পতঞ্জলি যেভাবে ব্যাকরণের প্রয়োজন বর্ণনা করেছেন, তা হতেও সূচিত হয় যে, সেই সময়েও ব্যাকরণের প্রতি পাঠকদের অনীহা জন্মেছিল। এমন কি ভর্তৃহরি'র উক্তি হতে জানা যায় যে, এক সময় মহাভাষ্যও লুপ্তপ্রায় হয়েছিল। অথচ ভাষাশিক্ষার জন্য তো ব্যাকরণ চাই-ই। তাই মধ্যবর্তী সময়ে সরল ও সংক্ষিপ্ত একাধিক ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়েছিল, যাদের মধ্যে কাতন্ত্র, সারস্বত, মুগ্ধ-বোধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা স্থানবিশেষে কিছুকাল চললেও ধীরে ধীরে তারা প্রায় লুপ্ত হয়েছে এবং পাণিনি-ব্যাকরণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাণিনি-ব্যাকরণের পুনরুজ্জীবনে যার অবদান সব থেকে বেশী, তিনি হচ্ছেন ভট্টোজি দীক্ষিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি কার্যকালপক্ষ অবলম্বনে সিদ্ধান্তকৌমুদী রচনা করেন। কার্য বা প্রক্রিয়া অনুসারে রচিত হওয়ায় যথোদ্দেশ পক্ষে যে অসুবিধা ছিল তা দূর হয় এবং শিক্ষার্থীদের কাছে তার সিদ্ধান্তকৌমুদী খুবই আদরণীয় হয়ে ওঠে। অবশ্য ভট্টোজিরও পূর্বে চতুর্দশ শতাব্দীতে বিমলসরস্বতী কার্যকালপক্ষ অবলম্বনে 'রূপমালা' এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামচন্দ্র প্রক্রিয়াকৌমুদী রচনা করেছিলেন। সিদ্ধান্তকৌমুদী ছাড়াও ভট্টোজি প্রৌঢ়মনোরমা ও শব্দকৌস্তুভ নামে ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন। ভট্টোজি রামচন্দ্রের প্রক্রিয়াকৌমুদী এবং তট্টীকা প্রক্রিয়াপ্রকাশের কাছে বহুলাংশে ঋনী।

এই ভট্টোজিরই অন্তেবাসী হচ্ছেন বরদরাজ। তিনি সিদ্ধান্তকৌমুদী হতে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী সূত্র এবং যথোপযোগী বৃত্তি গ্রহণ করে লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী রচনা করেন। সম্ভবতঃ তিনি গুরুর অনুমতি নিয়ে অথবা গুরুর আজ্ঞাতেই এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একই প্রকার উদ্দেশ্যে তিনি 'মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদী' নামে অপর এক গ্রন্থও রচনা

করেছিলেন। এছাড়া সারসিদ্ধান্ত কৌমুদী নামেও একটি গ্রন্থ তার রচনা বলে জানা যায়। সূত্র-নির্বাচন ছাড়া অন্যত্র গ্রন্থকারের মৌলিকতা যৎকিঞ্চিৎ। যদিও লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী বহুলপঠিত এবং প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী, তবু তার নির্বাচন ও বিষয়সন্নিবেশ সমালোচনার ঊর্দ্ধে নয়। আশ্চর্য লাগে যে প্রথম শিক্ষার্থীকে তিনি সকল লকারের ধাতুরূপ এমন কি যঙ্‌লুগন্ত পর্যন্ত শেখাতে চেয়েছেন, অথচ কারক ও সমাসকে প্রায় উপেক্ষা করেছেন। আবার যে লিঙ্গপ্রকরণ ছাড়া বাক্যরচনা করা যায় না, তাকেও তিনি শুধু অতিসংক্ষিপ্তই করেন নি, স্থান দিয়েছেন সবার শেষে। হয়ত দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে এটাই সেদিন যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়েছিল, অথবা তার চিন্তাধারায় ত্রুটি ছিল। এই ত্রুটি উপেক্ষা করলে গ্রন্থখানি যে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী, তা সকলেই স্বীকার করবেন, বস্তুতঃ দীর্ঘদিন ধরে এর পঠন-পাঠন চলে আসছে এবং এটাই গ্রন্থখানির উপাদেয়ত্বের বড় প্রমাণ।

পরিশেষে গ্রন্থ-সম্পাদন সম্বন্ধে দু-এক কথা বলব। সম্পূর্ণ লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদীর ব্যাখ্যা করার কোন পরিকল্পনা আমার ছিল না। আমার ব্যাকরণ জ্ঞানও যৎকিঞ্চিৎ। তবু ঘটনাচক্রে এই দায়িত্ব আমার উপর এসে পড়েছিল এবং কোনভাবে সেই দায়িত্ব পালন করেছি। হয়ত অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেল। পরে যে সব বিষয় যুক্ত করার কথা ভেবেছিলাম, আপাততঃ সে-সব পরিত্যাগ করতে হল। প্রচলিত গ্রন্থগুলিতে পদসাধনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে দেখা যায়। কিন্তু লঘুকৌমুদী প্রথম শিক্ষার্থীর জন্যই রচিত, একথা স্মরণে রেখে আমরা এ বিষয়টিকে তুলনায় সংক্ষিপ্ত করেছি। তবে জিজ্ঞাসু পাঠকের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হয় নি। উভয় দিক্ রক্ষা করা কতদূর সম্ভব হয়েছে, তা বিচারের ভার পাঠকের। অনেক গ্রন্থের সাহায্য নিয়েই এই গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। পৃথক্ নামোল্লেখ না করে তাদের সকলেরই কাছেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাঠকবর্গের যৎ-কিঞ্চিৎ উপকারে এলে শ্রম সার্থক বলে মনে করব। ছাপার ত্রুটি-বিচ্যুতি তারা যেন ক্ষমার চোখে দেখেন।

—গ্রন্থকার